উপসংহার

চা জনজাতিদের জীবন ও সংস্কৃতির উপর বস্তুগত কারণেই চা শিল্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । একদিকে বাইরে থেকে নিয়ে আসা শ্রমিকদের নতুন জীবিকার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় । অন্যদিকে চা চাষের জন্য স্থানীয়দের জমি উৎখাত করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় ।

পুঁজির লক্ষই হচ্ছে আসলে সস্তায় শ্রম পাওয়া । চা গাছ রোপণ, আগাছা পরিষ্কার করণ, সার প্রয়োগ করা, গাছ ছেঁটে দেওয়া, কচি পাতা চয়ন করা, চা পাতা শুকানো, সেঁকা, চা প্যাকিং ইত্যাদি বহুবিধ কাজের জন্য প্রয়োজন হয় দক্ষ অদক্ষ প্রচুর শ্রমিকের । পাতা তোলার কাজ যেহেতু অনেক ধৈর্যের বাগান মালিকেরা তাই মহিলাদেরকেই এই কাজে নিয়োগ করে থাকে, কারণ প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে মেয়েদের ধৈর্য শক্তি অনেক । ধৈর্যের সাথে সাথে সেই মহিলা শ্রমিককে দক্ষতা ও নৈপূণতাও অর্জন করতে হয় । কারণ দুটি পাতা একটি কুঁড়ি একসঙ্গে তুলতে না পারলে চায়ের উৎকর্ষতা ও আমেজ অনেকাংশেই নষ্ট হয়ে যায় । সভ্য সমাজের আমেজ বজায় রাখতে পর্দার পেছনে দিনরাত, ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে যারা খেঁটে যাচ্ছে তাদের জীবন সম্পর্কে অনেকেই ওয়াকিবহাল নন । সেই সব দক্ষ অদক্ষ শ্রমিকদেরও একটা জীবন রয়েছে, রয়েছে ভাষা, রয়েছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিও । যা খুব স্বাভাবিকভাবেই শাসকবর্গের কবলে চাপা পড়ে থাকে। ধারাবাহিকভাবে তাদের উপর চলতে থাকে শোষণ। তাদের

আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের কোনো চেষ্টা কোনো সরকারও নেয় নি, কোনো প্ল্যানটারস বা বাগান মালিকেরাও নেয় নি । বেঁচে থাকার জন্য যে তিনটে জিনিষ খুব প্রয়োজনীয়, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান, সেটারও কোনো ভালো ব্যবস্থা তাদের করে দেওয়া হল না । বাসস্থানের ব্যবস্থা তাদের এমনভাবে করে দেওয়া হল যাতে তারা কোনোদিনেই নিজেদের উন্নত করতে পারে না এবং প্রতিদিনই প্রকৃতির সাথে লড়াই করে তাদের থাকতে হয় । ঔপনিবেশিক প্রভুরা কোনদিনই এদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় নি,এদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারেও কোন গুরুত্ব নেয় নি। কারণ ঔপনিবেশিক শাসকেরা জানত যে এই জনজাতিরা শিক্ষিত হয়ে উঠলে, মাথা তুলে দাঁড়ালে তারা একদিন আর শ্রমিক খুঁজে পাবে না । তাই এদের 'হাঁড়িয়া' খাইয়ে চুপ করে বসিয়ে রাখত ঔপনিবেশিক প্রভুরা ।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকের হাত ধরে এখানে মানে বরাক উপত্যকায় চা বাগান গড়ে ওঠে । তারপর একসময় ব্রিটিশরা তাদের তলপি তল্পা গুটিয়ে এদেশ থেকে চলে যায় । দেশ স্বাধীন হয় । উপনিবেশোত্তর পরিবেশে শোষণের মাত্রাও পালটে যায় । উপনিবেশোত্তর চেতনা জ্যামিতিক নিয়মে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলেও শোষণ কিন্তু একই থাকে, ক্ষেত্র বিশেষে মাত্রাতিরিক্তও হয়। হয় বলেই ১৯২১ এর চরগোলা ভ্যালিতে শ্রমিক ধর্মঘটের বিকল্প একটা আন্দোলন আজও সংগঠিত হল না স্বাধীন দেশে। চা শ্রমিকের মানোন্নয়নে চরগোলা এক্সোডাস ঔপনিবেশিক ভারতের এক মাইলফলক হয়েই থাকল ।

উপনিবেশোত্তর চেতনা সবার আগে মুখোশ থেকে আসল চেহারাকে এবং পানীয়কে বোতল থেকে চিনিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয় । চা জনজাতিরা আসলে বুঝতেই পারে না আসল শত্রু যে কারা । কেন পারে না তার কারণ হল শিক্ষা । আজও একুশ শতকে দাঁড়িয়ে চা বাগানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ খোঁজা বিড়ম্বনামাত্র। ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে বাগানগুলোতে বিদ্যালয় অনেক কম । যে একটি দুটি রয়েছে শিক্ষক হয়তো নেই; ইদানিং টেট শিক্ষক নিয়োগ হলে শিক্ষকদের অভিযোগ আসে চা বাগানের শ্রমিকরা বাচ্চাদের বিদ্যালয়ে পাঠায় না । কেন পাঠায় না ? তার ও কারণ আছে । অর্থনৈতিক সমস্যা। চা শ্রমিকরা, সন্তান একটু বড় হলেই ভাবে কি করে সেই সন্তান বাইরে থেকে দুপয়সা রোজগার করে এনে পরিবার চালাতে সাহায্য করবে । দৈনিক মজুরি ৭৫ টাকা ছিল বর্তমানে সংশোধিত হয়ে ১০৫ টাকা হলেও তো আর হচ্ছে না । বর্তমান সব জিনিষের আকাশছোঁয়া মূল্যের জন্য । আবার এটাও দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সঙ্গে মজুরি কাঠামো এক নয় । প্রশ্ন জাগে তাদের কি কোন ক্ষোভ নেই এ নিয়ে ? অভিযোগ নেই কারো কাছে ? নিশ্চয়ই আছে, সেগুলো তাদের ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গানে উঠে আসে রূপকের ভাষায় । কিন্তু সরাসরি কাউকে বলতে পারে না । সাধারণ মানুষ যখন কিছু করতে পারে না তখন তার অভিযোগ করে নিজের কপালের কাছে । অভিযোগের পরের স্তরগুলোই তো হচ্ছে, ক্রোধ প্রতিবাদ বিদ্রোহ । আন্দোলনের শেষ হয় না, বিদ্রোহের শেষ নেই, এখনও অনেক চা বাগান রয়েছে যেখানে বাগান মালিকদের অধিক মুনাফা প্রদানে অক্ষম হলেই যখন খুশি বাগানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় । চা জনজাতিদের জীবন ও জীবিকা অনিশ্চয়তার মধ্যেই থেকে যাচ্ছে ।

এইসব চা জনজাতিরা যারা প্রতিদিন লড়াই করে যাচ্ছে প্রকৃতির সাথে, নিজের সাথে, মুখোশধারি শাসকদের হাতের পুতুল যারা, তাদের মননে নিশ্চয়ই উপনিবেশোত্তর চেতনা রয়েছে নইলে এত প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা বাঁচার লড়াই করে যাচ্ছে, বাঁচিয়ে রাখছে তাদের সংস্কৃতিকে! বিশ্বায়নের জাঁতাকলে পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় নি বলে এখনও ঝুমুরের সুর শোনা যায় । লড়াই চলছে, লড়াই চলবে ।

উপনিবেশোত্তর পর্বে এসে চা বাগানের জনজীবন কেন্দ্রিক আলোচনা করতে গিয়ে আমরা খুঁটিনাটি সব ব্যাপারগুলো বিশ্লেষণ করেছি ।যতটুকু আমরা আলোচনা করেছি তার শেষকথা বলে কিছু বলা মুশকিল তবু যে পর্যায়ে আমরা হাত দিয়েছিলাম, যে ভাবনা থেকে, যে বিন্দু থেকে আমরা সূচনা করেছিলাম সেখানে আর দাঁড়িয়ে নেই মনে হয়। তাদের লেখালেখি তাদের ভাবনা, তাদের জীবনপ্রণালী নিয়ে আরও ভাবনার প্রয়োজন আছে । তবে হাতের কাছে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে তাকে সামনে রেখে যেগুলো কথা আমাদের বলার তাই আমরা বলেছি এবং শেষে আমরা বলব যে অসম্ভব বলে কিছু নেই। উত্তরণ কোথাও সম্ভব বলে মনে হচ্ছে । উত্তর উপনিবশিক পর্বে বা স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে এসে আমরা যে ব্যাপারগুলো দেখলাম সবগুলোই নীতিগত ভাবে ঠিক আছে, শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সব বিষয়গুলোই ঠিক আছে কিন্তু যে অগ্রগতির কথা ছিল, সামনে এগোনোর যে প্রয়াস তা উপনিবেশিক কালে যা ছিল উত্তর উপনিবেশিক কালে এসেও খুব একটা পরিবর্তন কোথাও চোখে পড়ে না । কিছুটা হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না ; কিন্তু আমূল পরিবর্তন যেটা হওয়া দরকার তা হয়নি । যে বৈচিত্র আনয়নের প্রয়াস লক্ষ্য

করা গিয়েছিল তা সেরকমভাবে গড়ে ওঠেনি । তা হয়তো দীর্ঘ কয়েক দশক অব্যাহত থাকবে ।আশায় বাঁধি ঘর শুভবুদ্ধির উদয় হবে। এরাও একদিন গেয়ে উঠবে গান 'উই শ্যাল অভারকাম' । আমাদের ভাল লাগবে যারা উপত্যকার মধ্যে থেকেও একটা দ্বীপের মধ্যে বাস করছে, তারা বেরিয়ে আসবে একজাতি একপ্রান হয়ে। মানুষের অধিকারে মুখর হয়ে উঠবে।

সৃষ্টিশীল সাহিত্য থেকে চা জনজাতি সাহিত্যও অনেকটাই আলাদা । শ্রমিক সংগঠন গুলোর হাত ধরে উত্তর উপনিবেশে এসে দাঁড়ালেও কোথাও যেন মনে হয় আসলে তারা এখনও পর্যন্ত মুখোশধারি ঔপনিবেশিক শাসকদের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি । আজও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার আলো থেকে তারা অনেকটাই দূরবর্তী বলে তাদের প্রকৃত অবস্থান আমাদের অনেকেরই কাছে অধরা ও অস্পষ্ট থেকে যায় । মোটামুটি ভাবে আলোচনা থেকে যা বেরিয়ে আসে তা থেকে বোঝা যায় যে বরাক উপত্যকার চা বাগান গুলো ঔপনিবেশিক সময়ে যেরকম ছিল উপনিবেশোত্তর সময়ে এসেও খুব একটা পরিবর্তন চোখে এসে ঠেকায় না । তবে সুদূর ভবিষ্যতেও যে সুরাহা হওয়ার কোন লক্ষণ নেই তেমন নেতিবাচক চিন্তারও অবকাশ নেই । কারন তাদের প্রতিদিনের লড়াই থেকেই তা বোঝা যায়; তারা যেভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে নিজের সংস্কৃতিকে ঐতিহ্যকে, সাহিত্য সংস্কৃতিকে, তাতে আশার কিরণই শুধু উঁকি দেয় ।